

নেপালের দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা

নেপালের সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যা, পাহাড়ধস ও ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকির ভয়াবহতা আবারও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনো একক কোনো বিপদ হিসাবে আসে না। একটি দুর্যোগ, আরেকটি দুর্যোগকে তীব্রতর করতে পারে এবং একাধিক ঝুঁকি একসঙ্গে মিলে অল্প সময়ের মধ্যে একটি মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। প্রাণহানি, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো ধ্বংস, যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং মানুষের জীবিকা হারানোর মতো ঘটনা আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের যুগে আমরা কতটা প্রস্তুত। নেপালের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বাংলাদেশ সরাসরি হিমালয় অঞ্চলে না থাকলেও গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নাঞ্চলীয় দেশ। ফলে হিমালয় অঞ্চলের অতিবৃষ্টি, ভূমিধস, হিমবাহের পরিবর্তন কিংবা আকস্মিক জলপ্রবাহের সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়তে পারে। এর সঙ্গে দেশের নিজস্ব বন্যা, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি যোগ করলে বাংলাদেশের দুর্যোগের বাস্তবতা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগের প্রকৃতি ও ঝুঁকির ধরন বদলে দিচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির মতো তাত্ত্বিক দুর্যোগ পরিবর্তনের কারণ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু খরা, অতিবৃষ্টি, হিমবাহ গলে যাওয়া, পাহাড়ি ঢলের অস্থিতিশীলতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে ভবিষ্যতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শুধু দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর মোকাবিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, এটিকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সহনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রথমেই জানতে হবে কোথায় কী ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, কারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে, কীভাবে সেই ঝুঁকি কমানো যায় এবং দুর্যোগের আগে কী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কাঠামোটি হওয়া উচিত ঝুঁকি শনাক্তকরণ, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি, আগাম সতর্কবার্তা, আগাম পদক্ষেপ, উদ্ধার ও বিস্তানসম্মত পুনর্বাসন।

এখানে একটি মৌলিক তাত্ত্বিক ধারণা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, দুর্যোগের ক্ষতি শুধু প্রাকৃতিক বিপদের মাত্রার ওপর নির্ভর করে না। একই মাত্রার বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় একটি সুশৃঙ্খল ও প্রস্তুত সমাজে যে ক্ষতি করে, অপ্রস্তুত ও ঝুঁকিপূর্ণ সমাজে তার ক্ষতির পরিমাণ হয় বহুগুণ বেশি। ঝুঁকির সঙ্গে মানুষের বসবাসের স্থান, দারিদ্র্য, দুর্বল অবকাঠামো, সঠিক তথ্যের অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সরাসরি সম্পর্কিত। বাংলাদেশের জন্য তাই সবচেয়ে জরুরি হলো, একটি কার্যকর বহুমুখী আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শুধু বিপৎসীমার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে পারে কিংবা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, এ ধরনের তথ্যের সাধারণ মানুষের কাছে কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। তাদের জানতে হবে কোন এলাকায় কখন পানি উঠতে পারে, কোন রাস্তাটি নিরাপদ, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে এবং গবাদি পশু বা ফসল কীভাবে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, আমাদের সতর্কবার্তা ব্যবস্থাকে হতে হবে প্রভাবভিত্তিক ও মানুষকেন্দ্রিক। আবহাওয়ার তথ্য থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক ও সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত এবং সহজে বোধগম্য ভাষায় তথ্য পৌঁছাতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সতর্কবার্তার পর দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা। সতর্কবার্তা যদি আসে, কিন্তু মানুষ কোথায় যাবে বা কী করবে তা না জানে, তাহলে সবচেয়ে উন্নত পূর্বাভাসও কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। এ ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে বার্তা পৌঁছানোর বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পর্যায়ে সঠিক তথ্য তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেই তথ্য ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারের কাছে পৌঁছানো কিনা, সেটিই আসল প্রশ্ন। স্থানীয় মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক, মোবাইল নেটওয়ার্ক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ককে ব্যবস্থার মূল অংশ করা যেতে পারে। দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু সরকারের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে রাখলে হবে না, প্রয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো,

সতর্কবার্তার পর দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা। সতর্কবার্তা যদি আসে, কিন্তু মানুষ কোথায় যাবে বা কী করবে তা না জানে, তাহলে সবচেয়ে উন্নত পূর্বাভাসও কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। এ ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে বার্তা পৌঁছানোর বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পর্যায়ে সঠিক তথ্য তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেই তথ্য ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারের কাছে পৌঁছানো কি না, সেটিই আসল প্রশ্ন। স্থানীয় মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক, মোবাইল নেটওয়ার্ক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ককে ব্যবস্থার মূল অংশ করা যেতে পারে।

সমাজভিত্তিক সমন্বিত পদক্ষেপ। সরকার, স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, গণমাধ্যম, এনজিও এবং নাগরিক সমাজকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রশিক্ষিত কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা প্রয়োজন; কারণ দুর্যোগের প্রথম কয়েক ঘন্টায় জাতীয় পর্যায়ে সহায়তা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় মানুষই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, ঝুঁকি-সচেতন উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কোথায় হাসপাতাল, স্কুল, সেতু, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র কিংবা আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হবে, সেই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যৎ জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে। আজকের জলবায়ু বিবেচনা করে আগামী ৩০ বা ৫০ বছরের অবকাঠামো পরিকল্পনা করা যাবে না। প্রশ্ন হওয়া উচিত ভবিষ্যতের অতিবৃষ্টি, বন্যা, তাপপ্রবাহ বা ঘূর্ণিঝড়ের পরিস্থিতিতে এ অবকাঠামো টিকে থাকবে কি না।

দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ধ্বংস হওয়া ঘর বা সেতু আগের মতো করেই বানিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত একই ধরনের দুর্যোগ আবার হলে এ অবকাঠামো কীভাবে আরও নিরাপদ থাকবে। আমাদের নীতি হওয়া উচিত শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, বরং আগের চেয়ে আরও উন্নত ও নিরাপদ অবকাঠামো তৈরি করা। কৃষির ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষকের ক্ষতি শুধু একটি মৌসুমের উৎপাদন কমিয়ে দেয় না, বরং একটি পরিবারকে দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। তাই জলবায়ু-সহনশীল জাত, স্বল্পমেয়াদি ফসল, লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল প্রযুক্তি, ফসল বহুমুখীকরণ, ভাসমান কৃষি, নিরাপদ পশু আশ্রয়, জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ এবং কৃষিবিমার মতো উদ্যোগকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

সবশেষে মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু দুর্যোগকে মানবিক বিপর্যয়ে পরিণত হওয়া থেকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব। আর সেই সক্ষমতা তৈরি হয় বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, আগাম সতর্কতা, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার সমন্বয়ে। নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের সামনে সেই সুযোগই তৈরি করে দিয়েছে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নয়, সামগ্রিক দুর্যোগ সহনশীলতাই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন দর্শনের প্রধান অংশ।

প্রফেসর ড. মো. আসাদুজ্জামান সরকার : উপাচার্য, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
vc@kau.ac.bd